কাবলাল জুমা: কিছু নিবেদন

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

একজন সম্মানিত আলিমের একটি কথা, যিনি রিয়াদ থেকে পি.এইচ.ডি করেছেন এবং এখন এদেশের একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে খেদমতে নিয়োজিত আছেন, আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলেছেন, ‘‘আমাদের চলতে হবে সুন্নাহ এবং উম্মাহকে একসাথে নিয়ে।’’ এরপর তিনি একথার ব্যাখ্যা করেন, ‘‘সুন্নাহ হচ্ছে সূত্র ও দলীল এবং উম্মাহর জীবন-ব্যবস্থা। আর উম্মাহকে সাথে নিয়ে চলার অর্থ, মুসলিমজাহানের কোনো অঞ্চলে কোনো কাজ প্রচলিত থাকলে এবং সুন্নাহয় তার কোনো না কোনো দলীল পাওয়া গেলে সে কাজের বিরোধিতা করে উম্মাহকে পেরেশান করা উচিত নয়।’’

‘‘সুন্নাহ এবং উম্মাহ উভয়কে নিয়ে চলা এবং জুমহূর উম্মাহর সঙ্গে থাকার’’ অর্থ উপরোক্ত ব্যাখ্যার চেয়েও অনেক বিস্তৃত ও গভীর। কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু তিনি বলেছেন তা-ও স্বস্থানে অতি গুরুত্বপূর্ণ। উম্মাহর মাঝে ব্যাপকভাবে অথবা কোনো অঞ্চলে যে আমল জারি আছে, যদি তার কোনো শরয়ী সনদ থাকে, তখন শুধু একারণে তার বিরোধিতা করা যে, তা অমুক মাযহাবের বিরোধী বা অমুক আলিমের মতে তা দলীলবিহীন, এরপর এর বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা করে সাধারণ মানুষের মাঝে অস্থিরতা ছড়ানো শরীয়তের রীতি ও রুচির সম্পূর্ণ বিরোধী। আল্লাহর নবীর সুন্নাহ এবং সালাফের নীতি-আদর্শের সাথে এর কোনো মিল নেই।

হায়! দ্বীন ও ধর্ম যখন নানামুখি বিপদের সম্মুখীন তখন গোদের উপর বিষফোড়ার ন্যায় এই আপদ দেখা দিয়েছে যে, উম্মাহর মাঝে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত অনেক বিষয় সম্পর্কে (যা শুধু-এই নয় যে, কোনো রকম তার প্রমাণ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়; বরং যার প্রমাণই তুলনামূলক বেশি শক্তিশালী এবং যা সরাসরি সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত) প্রচার করা হচ্ছে যে, ‘তা বিদআত, ভিত্তিহীন ও সুন্নাহ-বিরোধী!’

মুসলমানের বর্তমান মুমূর্ষু অবস্থাতেও যাদের মনে করুণা জাগে না; বরং ‘জ্ঞান-গবেষণার’ নামে এবং ‘হাদীস-অনুসরণের’ শিরোনামে তাদেরকে আরো বেশি অস্থিরতা ও বিক্ষিপ্ততার মাঝে নিক্ষেপ করে চলেছেন তাদের সমীপে বিনীত নিবেদন, ‘অনুগ্রহ করে আপনার অধ্যয়ন-সীমা কিছুটা প্রশস্ত করুন এবং খানিকটা গভীর করুন, আর ‘ফুরু’-এর সাথে ‘উসূল’ পাঠেও খানিকটা অভ্যস্ত হোন। তাহলে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত বিষয়াদিকে ভিত্তিহীন ও প্রমাণহীন বলার পাপ থেকে আত্মরক্ষা সহজ হবে।

দেখুন, এ নিছক একটি পাপ নয়, অনেক পাপের সমষ্টি, যার অন্যতম হচ্ছে, উম্মাহকে তার ঐসব আলিম মনীষী সম্পর্কে আস্থাহীন করা, যাঁদের নিকট থেকে উম্মাহ দ্বীন ও ঈমান এবং সালাত ও সিয়াম শিখেছে। এ যে কোনো পুণ্যকর্ম নয় তা তো বলাই বাহুল্য। এ ঠিক এমনই, যেমন কেউ রিয়াদে গিয়ে শায়খ ইবনে বায রাহ. ও শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে সালিহ উছাইমীন রাহ.-এর ফতোয়াসমূহের বিরুদ্ধে হাদীস ও আছার প্রচার করতে থাকল এবং ঐ অঞ্চলের সাধারণ মুসলমানদের অস্থির ও উদভ্রান্ত করে তুলল।

এ তো জানা কথা যে, যেসব বিষয়ে হাদীস-সুন্নাহ-ভিত্তিক একাধিক ইজতিহাদী মত আছে তাতে এই কাজ করা মোটেই কঠিন নয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে দুদিকেই হাদীস ও আছার থাকে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এ জাতীয় কাজ করলে তা কি দ্বীনের সেবা ও খিদমত হবে, না ...?

দুই.

যেসব বিষয় উম্মাহর মাঝে প্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী দলীল দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সময়ে অপপ্রচারের শিকার তার একটি হচ্ছে জুমার আগের সুন্নত। খুব বিস্মিত হয়েছি যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে এ প্রশ্ন আসা শুরু হয়েছে যে, 'জুমার আগে সুন্নত পড়ার সূত্র কী, এ তো বিদআত। এর না কোনো দলীল আছে, না কোনো সহীহ হাদীস (নাউযুবিল্লাহ)!' জানা গেছে, এইসব কথা তাদের পক্ষ হতে ছড়ানো হয়েছে যারা সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে মনে করেন, মানুষের মনে ফিকহ ও ফকীহ সম্পর্কে অশ্রদ্ধা তৈরি করা এবং সাধারণ মানুষকে আলিমদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা দ্বীনের এক বড় খেদমত!

এঁরা যদিও মুজতাহিদ ইমামগণের 'তাকলীদ'-এর চরম বিরোধী, কিন্তু 'যাল্লাতুল উলামা' বা আলিমগণের ভুল ভ্রান্তির অনুসরণের বিষয়ে অতিআগ্রহী। তা না হলে এঁরা জুমার আগে সুন্নত পড়ার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতেন না। আমার জানা মতে, সম্ভবত সপ্তম হিজরী শতাব্দীতে কোনো আলিম এই দাবি করেছিলেন যে, সালাতুল জুমুআর আগে সুন্নত পড়া বিদআত (অথচ তা গোটা মুসলিমজাহানে সাহাবা-যুগ থেকে চলে আসছিল)।

আল্লাহ তাআলা জাযায়ে খায়ের দান করুন ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব হাম্বলী রাহ.কে (৭৯৫হি.), যাঁর তালীমের সূত্র ইমাম ইবনুল কাইয়েম রাহ. (৭৫১হি.) ও ইমাম ইবনে তাইমিয়া রাহ. (৭২৮হি.)-এর সাথে যুক্ত, তিনি এ বিষয়ে দুটি পুস্তক রচনা করেন:

١ـ نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة

٢ـ إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة.

এ দুটি পুস্তিকায় তিনি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ দ্বারা ঐ অভিনব দাবি জোরালোভাবে খন্ডন করেন। আমার সামনে পুস্তিকা দুটি নেই, তবে ‘সহীহ বুখারী’র উপর তাঁর অপূর্ব ভাষ্যগ্রন্থ ‘‘ফাতহুল বারী’’র পঞ্চম খন্ডে, যা অনেক আগেই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে, এ বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে। ঐখানে তিনি লিখেছেন, এ বিষয়ে যারা আরো বিশদ ও বিস্তারিত জানতে চান তারা যেন পুস্তিকা দুটি পাঠ করেন।

তিন.

কিছু মানুষ, যারা এই প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহর বিরোধিতা করেছেন, আমার জানা মতে, তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই যে, ‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় তো জুমার প্রথম আযান ছিল না। এখন যাকে দ্বিতীয় আযান বলা হয় সেটিই শুধু ছিল। অর্থাৎ যে আযান খতীবের সামনে দেওয়া হয়। আযানের পরেই খুতবা শুরু হত। আর খুতবা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই নামায। তাহলে কাবলাল জুমা পড়ার সুযোগ ছিল কোথায়? বোঝা গেল, ঐ যামানায় জুমার আগে কোনো নামায ছিল না।’

এই প্রশ্ন শুনে খুব অবাক হয়েছি। কারণ আম মানুষের কারো কারো এই ধারণা আছে বলে জানতাম যে, আযানের আগে সুন্নত পড়া যায় না, কিন্তু কোনো আলিমেরও এ জাতীয় বিভ্রান্তি হতে পারে, তা জানা ছিল না। যেমন ধরুন, যোহরের সময় সোয়া বারোটায় হয়ে গেল, মসজিদে সাধারণত আযান দেওয়া হয় পৌনে একটায়, আযানের আগে কি যোহরের সুন্নত পড়া যাবে না? নিঃসন্দেহে সবাই বলবেন, পড়া যাবে। তাহলে এ বলে জুমার সুন্নতকেই কীভাবে অস্বীকার করে দেওয়া যায় যে, ‘আযানের পর তো খুৎবা শুরু হয়, আর খুৎবার পর নামায, তাহলে সুন্নতের সময় কোথায়’?! কে না জানে, জুমার সুন্নত দ্বিতীয় আযানের আগে পড়া হত, এখনও আগেই পড়া হয়। সুতরাং এ প্রশ্নই অর্থহীন যে, ‘সুন্নতের সময় কোথায়?’ কোনো হাদীস কি আছে, আযানের আগে সুন্নত পড়া যায় না?

তাছাড়া তৃতীয় খলীফায়ে রাশেদ উসমান ইবনে আফফান রা.-এর যামানায় যখন প্রথম আযান শুরু হল এবং এর উপর সাহাবায়ে কেরামের ইজমাও সম্পন্ন হল তখন তো নিঃসন্দেহে এই আযানও শরীয়তসম্মত আযান, যা সুন্নাহর উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এখন তো এ প্রশ্ন আরো অর্থহীন যে, ‘আযানের আগে সুন্নত কীভাবে পড়া যাবে!’ কিংবা ‘আযানের আগে পড়া নামায কাবলাস সালাহ সুন্নত কীভাবে হবে?’ সুন্নত তো শরীয়তসম্মত আযানের পরই পড়া হচ্ছে।

চার.

অনেকগুলো সহীহ হাদীসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা আছে, জুমার জন্য যেন আগে আগে যাওয়া হয়, মসজিদে পৌঁছে যদি দেখা যায়, ইমাম খুৎবার জন্য আসেননি তাহলে নামায পড়বে, ইমাম এসে গেলে চুপচাপ বসে খুৎবা শুনবে। এ বিষয়ে যদি আর কোনো দলীল না-ও থাকত তাহলেও শুধু ঐ হাদীসগুলো দ্বারাই কাবলাল জুমা নামায প্রমাণিত হত। তবে ঐ নামায কি সুন্নতে মুয়াক্কাদা হবে, না গায়রে মুআক্কাদা সেটা সাব্যস্ত হত অন্য দলীল দ্বারা।

তো সহীহ ও মারফূ হাদীসের মাধ্যমে যখন কাবলাল জুমা নামায প্রমাণিত হল তখন এ দাবির অবকাশ কীভাবে থাকে যে, জুমার আগে কোনো নামায নেই।

আফসোস, ঐ হাদীসগুলোর আলোচনাও এখন কম হয়! নীচে কিছু হাদীস উপস্থাপিত হল।

عن عطاء الخراساني قال: كان نُبَيْشَةَ الهُذَلي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة، ثم أَقْبَلَ إلى المسجد لا يُؤْذِيْ أحدا، فإن لم يجد الإمام خَرَج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمامَ قد خرج، جلس، فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يُغْفَر له في جمعته تلك ذنوبُه كلُّها، أن تكون كفارة للجمعة التي تليها.

(তাবেয়ী) আতা খোরাসানী রাহ. নুবাইশা রা. থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করতেন যে, মুসলিম যখন জুমার দিন গোসল করে মসজিদের দিকে রওনা হয়, কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে, ইমাম (খুৎবার জন্য) বের হয়নি দেখলে যে পরিমাণ ইচ্ছা নামায পড়ে, ইমাম বের হয়ে থাকলে বসে যায় ও চুপচাপ শুনতে থাকে, একপর্যায়ে ইমামের সালাত ও কালাম সমাপ্ত হয়, তাহলে এ ব্যক্তির এ সপ্তাহের সকল গুনাহ যদি মাফ না-ও হয় এ তো অবশ্যই হবে যে, পরবর্তী জুমার জন্য তা কাফফারা হয়ে যায়। -মুসনাদে আহমদ খন্ড ৫, পৃ. ৭৫ (২০৭২১)

এই হাদীস 'সহীহ লি-গায়রিহী'। মুহাদ্দিস নূরুদ্দীন হাইছামী রাহ. 'মাজমাউয যাওয়াইদ'' কিতাবে (২/১৭১) □□□□□□□-

رجاله رجال الصحيح، خلا شيخ أحمد وهو ثقة.

২. সালমান ফারেসী রাহ. থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عن سلمان الفارسي قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطَهَّر ما استطاع من طُهر ويَدَّهن من دُهنِه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يُفَرِّق بين اثنين، ثم يُصَلِّي ما كُتِب له، ثم يُنْصِت إذا تكلَّم الإمام، إلا غُفِر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى.

[illegible]

[illegible]

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من اغتسل ثم أتى الجمعة فَصَلَّى ما قُدِّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام.

[illegible]

[illegible]

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله وعليه وسلم : من اغتسل يوم الجمعة واستاك، ومسَّ من طيب إن كان عنده، ولبِس من أحسن ثيابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فلم يتَخَطَّ رِقاب الناس حتى ركع ما شاء أن يركع، ثم أنصت إذا خرج الإمام فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها.

قال (الراوي) : وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادة، إن الله جعل الحسنة الحسنة بعشر أمثالها.

[illegible]

যায়। (বর্ণনাকারী ) বলেন, আবু হুরায়রা রা. বলতেন, এর সাথে আরো তিন দিনের (গুনাহ মাফ হয়)। আল্লাহ তাআলা নেক আমলকে দশগুণ বানিয়ে দেন।-মুসনাদে আহমদ ৩/৮১ (১১৭৬৭); সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ৩৪৩ (كتاب الطهارة، باب الغسل للجمعة)

এ হাদীসের সনদ 'হাসান'।

৫. আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اغتسل يـوم الجمعـة، ثم لبس ثيابه، ومَسَّ طيبا إن كان عنده، ثم مَشَى إلى الجمعة وعليه السكينة، ولم يَتَخَطَّ أحدا ولم يؤذه، رَكَـعَ ما قُضِي له، ثم انتَظَر حتى ينصرف الإمام، غُفِر له ما بين الجمعتين.

যে জুমার দিন গোসল করে, এরপর তার পোশাক পরিধান করে, তার কাছে সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে, এরপর ধীরস্থিরভাবে জুমার দিকে যায়, কাউকে ডিঙ্গিয়ে (সামনে) যাওয়া থেকে বিরত থাকে, কাউকে কষ্ট দেয় না, তাওফীক মতো রুকু (নামায আদায়) করে, এরপর ইমাম নামায সমাপ্ত করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তার দুই জুমার মাঝে যা (গুনাহ) হয়েছে তা মাফ করে দেওয়া হয়। -মুসনাদে আহমদ ৫/১৯৮ (২১৭২৯)

এই হাদীস 'সহীহ লিগায়রিহী'

এই হাদীসগুলোতে ইমাম খুৎবার জন্য উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত যে নামায পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে তা তো কাবলাল জুমা (জুমার আগের) নামাযই। গোসল করে জুমার জন্য ঘর থেকে বের হল এবং ইমামের অপেক্ষায় রইল, ইত্যবসরে যে নামায পড়া হবে তা যে 'কাবলাল জুমা' নামায এতে কোনো সন্দেহ আছে? যারা বলেন, জুমার আগে কোনো নামায নেই, তাদের উপরোক্ত হাদীসগুলো মনে রাখা প্রয়োজন।

এখানে এই দাবির সুযোগ নেই যে, ''এই হাদীসগুলোতে যে নামাযের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে তা নফল নামায।'' কারণ সুন্নতে কাবলিয়া (ফরজের আগে যে সুন্নত পড়া হয়) তাতে দুই ধরনের নামাযই আছে : সুন্নতে মুয়াক্কাদাও আছে, সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদাও (নফল) আছে। যোহরের আগের চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা, আর আসরের আগের চার রাকাত সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা (নফল)। কিন্তু নফল হওয়ার কারণে কি একথা বলা যাবে যে, 'আসরের আগে কোনো নামায নেই'?

পাঁচ.

কেউ কেউ বলেন, জুমার আগে নামায তো আছে, কিন্তু তা নফল নামায, যত রাকাত ইচ্ছা পড়বে। তাদের দাবি, ''জুমার আগে 'সুন্নতে রাতিবাহ' (সব সময় আদায় করার মতো সুন্নত) বা সুন্নতে মুয়াক্কাদা নেই।''

এঁদের সংশয়ের সূত্র বোধহয় এইখানে যে, উপরোক্ত হাদীসসমূহে তো রাকাত-সংখ্যা নির্ধারণ ছাড়াই নামায পড়তে উৎসাহিত করা হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায়, এটি নফল নামায। কিন্তু তাঁরা যদি এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীস ও আছার সামনে রাখতেন তাহলে পরিষ্কার হয়ে যেত যে, জুমার আগের নামায দুই প্রকারের: এক. নফল, যার যত রাকাত ইচ্ছা পড়তে পারে। দুই. সুন্নতে রাতিবা, যার রাকাত-সংখ্যাও নির্ধারিত এবং সে বিষয়ে তাকীদও আছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও তা আদায় করা প্রমাণিত।

খাইরুল কুরূন থেকে মুসলমানদের এ আমল চলে আসছে যে, তাঁরা জুমার আগের নফল নামায 'যাওয়ালে শামস' বা সূর্য ঢলে যাওয়ার আগেও পড়তেন, আবার পরেও পড়তেন, কিন্তু এই চার রাকাত পড়তেন সূর্য ঢলে যাওয়ার পরে। আর এরই নাম 'কাবলাল জুমা' বা 'জুমার আগের সুন্নত'।

এ বিষয়ে হাদীস ও আছার লক্ষ করুন।

প্রথমে আছার:

১. জাবালা ইবনে সুহাইম রাহ. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'তিনি জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন। মাঝে সালাম ফেরাতেন না।'

عن جَبَلة بن سُحَيْم، عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا لا يفصل بينهن بسلام، ثم بعد الجمعة ركعتين ثم أربعا.

-শরহু মাআনিল আছার, তহাবী পৃ. ১৬৪-১৬৫

আল্লামা নীমাভী রাহ. ''আছারুস সুনান'' পৃ. ৩০২-এ এর সনদকে সহীহ বলেছেন। ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. ''ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী'' গ্রন্থে (৫/৫৩৯) একে প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা . জুমার আগে দীর্ঘসময় নামায পড়তেন। কিন্তু উপরের বর্ণনায় চার রাকাতকে আলাদা করে এজন্যই উল্লেখ করা হয়েছে যে , তা সুন্নতে রাতিবা।

নাফে রাহ . বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা . জুমার আগে দীর্ঘ সময় নামায পড়তেন (يطيل الصلاة قبل الجمعة) আর জুমার পরে ঘরে গিয়ে দুই রাকাত পড়তেন । আর বলতেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করতেন । (সুনানে আবু দাউদ , হাদীস : ১১২৮, কিতাবুল জুমুআ )

ইমাম ইবনে রজব রাহ . সহীহ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে এই হাদীসের আলোচনায় লেখেন -

وظاهر هذا يدل على رفع جميع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم : صلاته قبل الجمعة وبعدها في بيتـه، فإن اسم الإشارة يتناول كل ما قبله مما قرب وبعد، صرح به غير واحد من الفقهاء والأصوليين.

وهذا فيما وضع للإشارة إلى البعيد أظهر، مثل لفظة ذلـك، فـإن تخصـيص القـريب بهـا دون البعيـد يخـالف وضعها لغة.

আহলে ইলম বুঝতে পারছেন , এখানে ইবনে রজব হাম্বলী রাহ . ঐ ব্যক্তিদের বক্তব্য খন্ডন করছেন যারা বলেছেন যে , সুনানে আবু দাউদের উপরোক্ত হাদীস দ্বারা শুধু ‘বা ’দাল জুমা ’ (জুমার পরের নামায ) মারফূ হওয়া প্রমাণিত হয় , কাবলাল জুমা নয়। উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ‘যাদুল মাআদ ’ ও ‘ফতহুল বারী , ইবনে হাজার ’-এর আলোচনার দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে যায়।

যাক, এ তো ছিল একটি প্রাসঙ্গিক কথা। আমি কাবলাল জুমা চার রাকাত সুন্নত সম্পর্কে আছার উল্লেখ করছিলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা .-এর আছর উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় আছর এই -

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা . থেকে বর্ণিত , ‘তিনি জুমার দিন নিজ ঘরে চার রাকাত পড়তেন। এরপর মসজিদে আসতেন এবং জুমার আগে আর কোনো নামায পড়তেন না , জুমার পরেও না। ’

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصلي يـوم الجمعـة في بيتـه أربـع ركعـات، ثم يـأتي المسـجد فلا يصلي قبلها ولا بعدها.

এই আছরটি মুহাদ্দিস হার্ব ইবনে ইসমাঈল আলকিরমানী (২৮০হি .) তাঁর কিতাবে সনদসহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইবনে রজব রাহ . বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে (৫/৫৮০) তা দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

উল্লেখ্য , এ বর্ণনায় জুমার পরে কোনো নামায না -পড়ার অর্থ হবে মসজিদে না পড়া।

৩. সাফিয়া রাহ . বলেন, তিনি (উম্মুল মুমিনীন ) সফিয়্যাহ রা .কে দেখেছেন , জুমার জন্য ইমাম আসার আগে চার রাকাত পড়েছেন। এরপর ইমামের সাথে দুই রাকাত জুমা আদায় করেছেন।

عن صافية قالت : رأيت صفية بنت حُيَيّ رضي الله عنها : صلَّت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعـة، ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين.

তবাকাতে ইবনে সা ’দ ; নসবুর রায়াহ ২ /২০৭; ফাতহুল বারী , ইবনে রজব ৫/৫৩৯

নারীদের উপর জুমা ফরয নয় , তাঁরা ঘরে যোহর পড়ে থাকেন। তবে কখনো যদি জুমা পড়েন তবে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। ঐ অবস্থায়ও তাদের জুমার আগে চার রাকাত পড়া উচিত , যেমনটা সাফিয়্যাহ রা .-এর আমল থেকে জানা গেল।

৪. আবু ওবায়দা রাহ . বর্ণনা করেন , (আববাজান) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন।

عن أبي عُبَيْدة، عن عبد الله قال : كان يصلي قبل الجمعة أربعا.

-মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা খন্ড ৪ , পৃ . ১১৪ (৫৪০২)

তাবেয়ী ক্বাতাদা রাহ .ও একথাই বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন , আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন , জুমার পরেও চার রাকাত পড়তেন।

أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات وبعدها أربع ركعات.

-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক খন্ড ৩ , পৃ . ২৪৭ (৫৫২৪)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . শুধু নিজে চার রাকাত পড়তেন এমন নয় , তিনি অন্যদেরও চার রাকাত কাবলাল জুমা পড়ার আদেশ দিতেন।

তাঁর বিশিষ্ট শাগরিদ আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী রাহ .-এর বর্ণনা : আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা . আমাদেরকে জুমার আগে চার রাকাত এবং জুমার পরে চার রাকাত পড়ার আদেশ করতেন। পরে যখন আলী রা. আগমন করলেন তখন তিনি আমাদেরকে জুমার পরে প্রথমে দুই রাকাত এরপর চার রাকাত পড়ার আদেশ করেন।

كان عبد الله يأمر أن نُصَلِّي قَبْلَ الجُمْعة أربعا، وبعدها أربعا، حتى جاءنا علي فأمرنا أن نصلي بعدها ركعتين ثم أربعا.

-মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক খন্ড ৩ , পৃ . ২৪৭ (৫৫২৫)

নফল নামাযের বিষয়ে উৎসাহ দেওয়া যায় , আদেশ দেওয়া যায় না। আদেশ করার অর্থ , এই নামায অন্তত সুন্নতে মুয়াক্কাদা , যেমন পরের চার রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

এ বর্ণনার সনদ সহীহ ও মুত্তাছিল।

এই বর্ণনায় লক্ষণীয় বিষয় এই যে , খলীফায়ে রাশিদ আলী ইবনে আবী তালিব রা . যখন কুফায় এসে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা .-এর শিক্ষা দেখলেন এবং তাঁর আদেশ সম্পর্কে অবগত হলেন তখন তিনি কাবলাল জুমার বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করেননি , শুধু বা ’দাল জুমা চার রাকাতের সাথে আরো দুই রাকাত যোগ করার আদেশ করেছেন। ফলে পরবর্তী সময়ে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ .সহ আরো অনেক ইমামের নিকটে , জুমার পরের সুন্নত সর্বমোট ছয় রাকাত। এ থেকেও প্রমাণিত হয় খলীফায়ে রাশিদ আলী ইবনে আবী তালিব রা .-এর নিকটেও কাবলাল জুমার সুন্নত চার রাকাত।

এ শুধু উপরোক্ত চার , পাঁচজন সাহাবীরই আমল নয় , খাইরুল কুরূনে সাহাবা -তাবেয়ীনের সাধারণ আমল এটিই ছিল। দু ’টি বর্ণনা লক্ষ করুন :

৫. তাবেয়ী আমর ইবনে সায়ীদ ইবনুল আস রাহ . (৭০হি .) বলেন, ‘আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণকে দেখতাম , জুমার দিন সূর্য যখন ঢলে যেত তখন তাঁরা দাড়িয়ে যেতেন এবং চার রাকাত পড়তেন। ’

كنت أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس يوم الجمعة، قاموا فصلوا أربعا.

এ আছরটি ইমাম আবু বকর আল-আছরাম রাহ. (২৭৩হি .) তাঁর কিতাবে বর্ণনা করেছেন । তাঁর সূত্রে ইমাম ইবনে আব্দুল বার রাহ . ‘‘আততামহীদ’’ (খন্ড ৪ , পৃ . ২৬ حديث ثامن لزيد بن أسلم)) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ।

এই বর্ণনার সনদ নিম্নরূপ :

قال الأثرم : حدثنا منجاب بن الحارث قال : أخبرنا خالد بن سعيد بن عمـرو بن سـعيد بن العـاص عن أبيـه قال : كنت أرى ...

আহলে ইলম জানেন, এ সনদটি সহীহ। গ্রন্থকার 'আছরাম' তো ইমাম, 'মিনজাব' ছিকা রাবী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য কিতাবে তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ১৩১ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল। (তাহযীবুত তাহযীব খন্ড ১০, পৃ. ২৯৭-২৯৮; তাকরীবুত তাহযীব ৬৮৮২)

তাঁর উস্তাদ 'খালিদ ইবনে সায়ীদের' রেওয়ায়েতও সহীহ বুখারীতে আছে। ইমাম মুসলিম রাহ. মুহাম্মাদ ইবনে বিশ্র থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি তাকে الثقة الصدوق المأمون উপাধিতে ভূষিত করেছেন। (তাহযীবুত তাহযীব খন্ড ৩, পৃ. ৯৫)

তাঁর পিতা 'আমর ইবনে সায়ীদ' তো প্রসিদ্ধ তাবেয়ী, যিনি অনেক সাহাবীকে দেখেছেন। অনেক সাহাবীর জীবদ্দশায় ৭০ হিজরীতে তাঁর ইন্তেকাল।

এই আছরটি আবু বকর আল আছরামের উদ্ধৃতিতে ইবনে রজব রাহ. বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থে (খন্ড ৫, পৃ. ৫৪২) উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি আছরাম রাহ.-এর হাওয়ালায় এই আছরও বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আবু বকর ইবনে আইয়াশ রাহ. বলেন, আমরা জুমায় (তাবেয়ী ইমাম) হাবীব ইবনে আবী ছাবিত (রাহ.)-এর সাথে থাকতাম। তিনি জিজ্ঞাসা করতেন, 'সূর্য কি ঢলে গেছে?' এরপর নিজেও দেখতেন। সূর্য ঢলার পর তিনি কাবলাল জুমা চার রাকাত নামায পড়তেন।

ইবনে রজব রাহ. ছাড়া ইবনে কুদামা হাম্বলী রাহ.ও এই আছর ''আলমুগনী''তে (খন্ড ৩, পৃ. ২৫০) উল্লেখ করেছেন। এর আরবী পাঠ -

فإذا زالت الشمس صَلَّى الأربع التي قبل الجمعة.

আমর ইবনে সায়ীদ রাহ.-এর বিবরণ দ্বারা সাহাবা-যুগের তা'আমুল (কর্মধারা) সামনে এল। এবার সাহাবা-যুগ ও তাবেয়ী-যুগের কর্মধারা দেখুন:

২. (তাবেয়ী) ইবরাহীম নাখায়ী রাহ. (৯৫হি.) বলেন, 'তাঁরা জুমার আগে চার রাকাত পড়া পছন্দ করতেন।'

قال إبراهيم النخعي : كانوا يحبون أن يصلوا قبل الجمعة أربعا.

-কিতাবুল ঈদাইন , ইবনে আবিদ দুন্‌য়া

ইমাম ইবনে রজব রাহ . বলেন, ‘এই আছরের সনদ সহীহ।’ এরপর তিনি ইমাম ইবনে আবী খাইছামা রাহ .-এর ‘‘কিতাবুত তারীখে’’র উদ্ধৃতিতে ইবরাহীম নাখায়ী রাহ .-এর এই বক্তব্য বর্ণনা করেছেন যে , ‘যখন আমি তোমাদেরকে كانوا يستحبون (তারা পছন্দ করতেন ) বলব তাহলে তা এমন বিষয় হবে , যার উপর তাঁদের ইজমা ছিল ।’ (ফাতহুল বারী খন্ড ৫ , পৃ . ৫৪০)

ইবরাহীম নাখায়ী রাহ .-এর বক্তব্য থেকে জানা গেল , তিনি যখন (তাঁরা পছন্দ করতেন ) শিরোনামে কোনো আমল বর্ণনা করেন তখন তা অন্তত কুফায় অবস্থানকারী সাহাবা - তাবেয়ীন (যাদের সংখ্যা ছিল কয়েক হাজার )-এর সর্বসম্মত কর্মধারা হবে। তো সে যুগের এই সাধারণ কর্মধারা ইবরাহীম নাখায়ী রাহ .-এর সূত্রে ইমাম ইবনে আবী শাইবা রাহ .ও তাঁর ‘‘আলমুসান্নাফ’’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। (দ্র . আলমুসান্নাফ খন্ড , ৪, পৃ . ১১৫-১১৬; ৫৪০৫)

সাহাবা -তাবেয়ীনের এই সাধারণ কর্মধারা প্রমাণ করে , জুমার আগে নফল নামাযের রাকাত -সংখ্যা যদিও নির্ধারিত নয় , প্রত্যেকে নিজ নিজ ইচ্ছা ও অভিরুচি অনুযায়ী পড়বে। তবে এসময় চার রাকাত নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। আর তা পড়া হত সূর্য ঢলে যাওয়ার পর দ্বিতীয় আযানের আগে।

আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা .-এর ঐ চার রাকাতের আদেশ দেওয়া এবং খলীফায়ে রাশেদের তাঁর সাথে একমত থাকা , বলাই বাহুল্য , নিছক ইজতিহাদের ভিত্তিতে হতে পারে না। এ কারণে তাঁর এই হুকুম ‘‘মারফূ হুকমী’’ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

যারা দাবি করেন কোনো হাদীসেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জুমার আগে নামায পড়া প্রমাণিত নয় -না ঘরে , না মসজিদে , তাদের দাবি সত্য নয়। যদি তা সত্যও হত তবুও উপরোক্ত আছর , সাহাবা -তাবেয়ীনের ব্যাপক রীতি এবং উপরে উল্লেখিত ‘মারফূ হুকমী’ একথা প্রমাণে যথেষ্ট হত যে , জুমার আগে চার রাকাত সুন্নতে রাতিবা (মুয়াক্কাদাহ ) রয়েছে।

ক্বাবলাল জুমআ সুন্নত সম্পর্কে স্পষ্ট মারফূ হাদীস

এ বিষয়ে সুনানে ইবনে মাজাহর একটি হাদীসই তালিবানে ইলমের হাতের কাছে থাকায় শুধু এ হাদীসটির কথাই সাধারণত বলা হয়। আর এর সনদ অতি দুর্বল হওয়ায় বলে দেওয়া হয় , ‘এ বিষয়ে যে মারফূ হাদীসটি আছে তার সনদ অতি দুর্বল। সেটি ছাড়া আর কোনো

মারফূ হাদীস নেই।’ এই ধারণা ঠিক নয়। জুমার আগে নামায পড়া আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক দলীল দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়টিই নিবেদন করার ইচ্ছা রাখি। অনুরোধ করি, ধৈর্যের সাথে পুরো আলোচনাটি পাঠ করার।

সুনানে ইবনে মাজায় (কিতাবুল জুমা, বাবুস সালাহ কাবলাল জুমা-র অধীনে) হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে:

عن بقية، عن مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطاة، عن عطية العوفي، عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع قبل الجمعة أربعا لا يفصل في شيء منهن.

বাকিয়্যাহ মুবাশশির ইবনে উবাইদ থেকে, তিনি হাজ্জাজ ইবনে আরতাত থেকে, তিনি আতিয়্যা আল আওফী থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন। মাঝে (সালামের দ্বারা) আলাদা করতেন না, (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পড়ে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন)।’-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস : ১১২৯

সনদের যে অংশ উল্লেখিত হয়েছে তাতেই ‘আসমাউর রিজাল’-বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বুঝতে পেরেছেন, এই সনদ অতি দুর্বল, বিশেষত মুবাশশির ইবনে উবাইদ তো এমন রাবী, যার সত্যবাদিতাই সংশয়পূর্ণ। সুতরাং এই সনদ যে নির্ভরযোগ্য নয় তাতে আর সন্দেহ কি। ব্যাস, এখান থেকেই প্রসিদ্ধ করে দেওয়া হল যে, এ বিষয়ে একমাত্র হাদীস ইবনে মাজার হাদীসটি, আর তা অতি দুর্বল।

‘‘ইলাউস সুনানে’’ ‘‘মাজমাউয যাওয়াইদ’’ এর বক্তব্য থেকে অনুমান করা হয়েছিল যে, এ হাদীস তবারানীতে যে সনদে বর্ণিত হয়েছে তাতে বোধ হয়, মুবাশশির ইবনে উবাইদ নেই, সুতরাং ঐ সনদ নির্ভরযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এই অনুমান সঠিক প্রমাণিত হয়নি। তবারানীর ‘‘আলমু’জামুল কাবীরে’’ এই রেওয়াতের সনদ সেটিই যা ইবনে মাজার সনদ। এতে মুবাশশির ইবনে উবাইদ আছে। আর এটা নসবুর রায়া (খন্ড ২, পৃ. ২০৬) থেকেও বোঝা যায়। যাহোক, এতে এই ধারণা আরো প্রবল হয়ে গেল যে, এ বিষয়ে কোনো সহীহ মারফূ হাদীস নেই!

আগেই বলেছি, এই ধারণা সঠিক নয়। আর তা সঠিক নয় কয়েক কারণে। এক. কয়েকজন হাফিযুল হাদীস স্পষ্টভাষায় বলেছেন, হাদীসটি ইবনে মাজা যে সনদে বর্ণনা করেছেন তা জয়ীফ বটে, কিন্তু ইমাম আবুল হাসান আল খিলায়ী রাহ. (৪৯২ হি.) ‘‘আল ফাওয়াইদ’’ কিতাবে তা নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণনা করেছেন। সনদের শেষ অংশ তাঁরা উল্লেখও করেছেন। হাফেয আবু যুরআ ইরাকী (৮২৬ হিজরী) তরহুত তাছরীব গ্রন্থে (খ. ৩, পৃ. ৩৬) লেখেন-

والمتن المذكور رواه أبـو الحسـن الخِلَعي في فوائـده بإسـناد جيـد من طريـق أبي إسـحاق عن عاصـم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.

সুতরাং এ বিষয়ের প্রথম মারফূ হাদীস যার সনদ নির্ভরযোগ্য তা এই -

১. আবু ইসহাক আস সাবীয়ী আসিম ইবনে দমরা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আলী রা. থেকে, যে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার আগে চার রাকাত পড়তেন।’ (আল-ফাওয়াইদ, আবুল হাসান আল খিলায়ী -তরহুত তাছরীব খ ৩, পৃ. ৩৬)

একাধিক হাদীসবিশারদ ‘‘আল ফাওয়াইদ’’-এর উদ্ধৃতিতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং সনদ নির্ভরযোগ্য বলেছেন। যেমন :

ক. হাফিয যাইনুদ্দীন ইরাকী (৮০৬ হি.) (দ্র. ফয়যুল কাদীর)

খ. হাফিয আবু যুরআ ইরাকী (৮২৬ হি.) (দ্র. তরহুত তাছরীব ৩/৩৬)

গ. হাফিয শিহাবুদ্দীন আল বূসীরী (৮৪০ হি.) (দ্র. মিসবাহুয যুজাজাহ ফী যাওয়াইদি ইবনে মাজাহ খ. ১, পৃ. ১৩৬)

ঘ. মুহাদ্দিস আব্দুর রঊফ আল

মুনাভী (১০৩১ হি.) (দ্র. ফয়জুল কাদীর খ. ৫ পৃ. ২১৬)

ঙ. মুহাদ্দিস মুরতাজা যাবিদী (১২০৫ হি.) (দ্র. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন ফি শরহি ইহইয়াই উলূমিদ্দীন খ. ৩, পৃ. ২৭৫)

সনদের শেষ অংশ তো তাঁরা উল্লেখ করেই দিয়েছেন, যা কমসে কম ‘হাসান’ পর্যায়ের। আর আবুল হাসান আল খিলায়ী থেকে আবু ইসহাক আস সাবীয়ী পর্যন্ত সনদের যে অংশ তা উল্লেখ না করলেও তাঁরা একবাক্যে বলেছেন, তা ‘জাইয়েদ সনদ’ যার শাব্দিক অর্থ উত্তম সনদ। আর উসূলে হাদীসের পরিভাষায় ‘জাইয়েদ সনদ’ কে ‘হাসান’-এর উপরে গণ্য করা হয়। (তাদরীবুর রাবী খ. ১ পৃ. ১৭৮)

আবুল হাসান আল খিলায়ীর সনদের সমর্থন ঐ রেওয়ায়েত দ্বারাও হয়, যা তবারানী ‘‘আলমুজামুল আওসাত’’ কিতাবে এবং আবু সায়ীদ ইবনুল আরাবী তাঁর ‘‘আলমু’জাম’’ কিতাবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি এই -

محمد بن عبد الرحمن السَّهْمي، حدثنا حُصَيْن بن عبد الرحمن السُّلَمِي، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة أربعا، وبعدها أربعا، يجعل التسليمَ في آخرهن.

২. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আসসাহমী বর্ণনা করেন, আমাদেরকে হুসাইন ইবনে আব্দুর রহমান আসসুলামী বর্ণনা করেছেন, তিনি আবু ইসহাক (সাবীয়ী) থেকে, তিনি আসিম ইবনে দমরা থেকে, তিনি আলী রা. থেকে, যে ''আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার আগে চার রাকাত এবং জুমার পরে চার রাকাত পড়তেন এবং সর্বশেষ রাকাতে সালাম ফেরাতেন।''-আলমুজামুল আওসাত, তবারানী খ. ২, পৃ. ৩৬৮ আলমু'জাম আবু সায়ীদ ইবনুল আরাবী -লিসানুল মীযান খ. ৭, পৃ. ২৭৮, ৫ : ২৪২)

সনদের মান : সনদের সকল রাবী পরিচিত ও প্রসিদ্ধ এবং উত্তম স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও

নির্ভরযোগ্য । সামান্য আপত্তি শুধু আছে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আস-সাহমী সম্পর্কে। তাঁর ব্যাপারে ইমাম আবু হাতিম বলেছেন ليس بالمشهور অর্থাৎ 'তিনি তেমন

প্রসিদ্ধ রাবী নন'। হযরতুল ইমামের এ উক্তি লিসানুল মীযানে এভাবেই আছে। তবে ইবনে আবী হাতিম এর কিতাব ''আলজরহু ওয়াত তা'দীলে'' (খ. ৩ কিসত : ২ পৃ. ৩২৬) লেখা আছে ليس بمشهور যার অর্থ : 'তিনি প্রসিদ্ধ নন'। যা হোক, লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আবু হাতিম রাহ. তাuঁক 'মাজহূল' (অপরিচিত) বলেননি। এদিকে ইমাম ইবনে আদী রাহ. ''আল-কামিল'' কিতাবে (খ. ৬, পৃ. ১৯১-১৯২) তাঁর বর্ণনাসমূহ পরীক্ষা করার পর নিম্নোক্ত ভাষায় তার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছেন-

وهو عندي لا بأس به.

অর্থাৎ 'আমার কাছে এই রাবীর মাঝে অসুবিধার কিছু নেই।'

আহলে ইলমের জানা আছে, হাদীস-বিশারদ ইমামগণ এ ধরনের মন্তব্য সাধারণত ঐ সকল রাবী সম্পর্কে করেন যাদের রেওয়ায়েত 'হাসান' পর্যায়ের হয়।

এদিকে ইমাম ইবনে হিববান তাঁকে ''কিতাবুছ ছিকাত'' (খ. ৯, পৃ. ৭২)-এ অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যার অর্থ, তিনি তাঁর নিকটে 'ছিকা' রাবীদের মধ্যে গণ্য।

''লিসানুল মীযান'' কিতাবে অবশ্য ইবনে আবী হাতিমের উদ্ধৃতিতে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন থেকে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি এই রাবীকে 'জয়ীফ' বলেছেন, কিন্তু ইবনে আবী হাতিমের 'কিতাবুল জরহি ওয়াত তা'দীলে (খ. ৩, কিসত : ২, পৃ. ৩২৬) এই বক্তব্য আমরা

পাইনি, তদ্রূপ ''তারীখে ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীনে''ও না। একারণে এই উদ্ধৃতিটি সংশয়পূর্ণ।

এই রাবী সম্পর্কে ন্যায়সংগত সিদ্ধান্ত সেটিই যা ইবনে আদী রাহ. বলেছেন। এ কারণে আলোচিত হাদীসটি সনদের বিচারে তো 'হাসান' পর্যায়ের, কিন্তু এর মতন (বক্তব্য) সাহাবা-তাবেয়ীন যুগে ব্যাপকভাবে বরিত ও অনুসৃত (মুতালাক্কা বিলকবূল) ছিল, যা প্রবন্ধের শুরুতে উল্লেখিত আছার ও তাআমুল (কর্মধারার) বিবরণ থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়েছে। ঐখানে বলা হয়েছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. জুমার আগে চার রাকাত পড়ার যে আদেশ করেছিলেন, আলী রা. তা বহাল রেখেছিলেন। বলাবাহুল্য, এর কারণ

এ-ই হবে যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছেন। যার বিবরণ তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসে এসেছে।

৩. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আস-সাহমীর এ বর্ণনার সমর্থন আলী রা.-এর ঐ প্রসিদ্ধ হাদীস দ্বারাও হয়, যা সুন্নত ও নফল সম্পর্কে খুবই প্রসিদ্ধ এবং 'সুনান' ও 'মাসানীদ' গ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত।

আসিম ইবনে দমরা বলেন -

أتينا عليا، فقلنا : يا أمير المؤمنين ألا تحدثنا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار تطوعا؟ فقال : من يطيق ذلك منكم؟ قلنا نأخذ منه ما أطقنا.

আমরা আলী রা. এর কাছে এলাম এবং আরজ করলাম, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি কি আমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সালাতুত তাতাওউ' (সুন্নত ও নফল নামাযসমূহের) বিষয়ে অবগত করবেন না? তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে তার (অনুসরণের) হিম্মত রাখে? আরজ করলাম, 'আমরা সাধ্যমতো আমল করব।'

এরপর আলী রা. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিবসের সুন্নত ও নফল নামাযের বিবরণ দিলেন। প্রথমে ফজরের পর সূর্য মাথার উপর আসার আগ পর্যন্ত দুই নামাযের কথা বললেন: দুই রাকাত এবং চার রাকাত (অর্থাৎ ইশরাকের দুই রাকাত ও চাশতের চার রাকাত)

এর পর বলেন-

ثم أمهل فإذا زالت الشمس قام فصلى أربعا، ثم صلى بعد الظهر ركعتين، ويصلي قبل العصر أربعا، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين ومن اتبعهم من المؤمنين والمسلمين، فتلك ست عشرة ركعة.

'এরপর তিনি নামায পড়া থেকে বিরত থাকতেন। যখন সূর্য ঢলে যেত তখন দাঁড়াতেন ও চার রাকাত পড়তেন। এরপর যোহরের পর দুই রাকাত পড়তেন, আসরের আগে চার রাকাত পড়তেন। প্রতি দুই রাকাতকে তাশাহহুদ দ্বারা আলাদা করতেন। এ হল সর্বমোট ষোল রাকাত। (আল-আহাদীসুল মুখতারা, যিয়াউদ্দীন আলমাকদেসী খ. ১, পৃ. ১৪২-১৪৩ হাদীস : ৫১৪)

সুনানে ইবনে মাজায় (হাদীস : ১১৬১) এই হাদীসের শেষে আছে -

قال علي فتلك ست عشرة ركعة، تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. قال وكيع : زاد فيه أبي : فقال حبيب بن أبي ثابت : يا أبا إسحاق! ما أحب أن لي بحديثك هذا مِلْءَ مسجدك هذا ذهبا.

অর্থাৎ, আলী রা. বললেন, 'এ হচ্ছে সর্বমোট ষোল রাকাত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিনের তাতাওউ (নফল ও সুন্নত) নামায। খুব অল্প সংখ্যক মানুষই তা নিয়মিত আদায় করে।'

রাবী বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করার পর (উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে থেকে ইমাম) হাবীব ইবনে আবী ছাবিত বলে উঠলেন, 'আবু ইসহাক! আপনার বর্ণিত এই হাদীসের বিনিময়ে তো আপনার এই মসজিদ ভরে যায় এই পরিমাণ স্বর্ণের মালিক হওয়াও আমি পছন্দ করব না!

এ হাদীসে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর যে চার রাকাতের কথা এসেছে, খুব সহজেই বোঝা যায়, সপ্তাহের ছয়দিন তা যোহরের আগের সুন্নত আর জুমার দিন জুমার আগের সুন্নত। কিন্তু অধিকাংশ দিনে তা যেহেতু 'কাবলায যোহর' আর জুমাও হচ্ছে যোহরেরই স্থলাভিষিক্ত তাই এ চার রাকাতকে অন্যান্য বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে -

وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس

(এবং জোহরের আগে চার রাকাত, যখন সূর্য ঢলে যায়) এবং এভাবে -

ويصلي قبل الظهر أربعا.

(এবং যোহরের আগে চার রাকাত পড়তেন)

এই বর্ণনাগুলোতে ‘যোহর’ শব্দ ব্যবহৃত হওয়ায় অনেকে মনে করেছেন, এই চার রাকাত শুধু ‘যোহরের নামাযে’র আগে পড়তে হবে, কারণ এই হাদীসে তো ‘কাবলায যোহর’ বলা হয়েছে, ‘কাবলাল জুমা নয়!’ বলাবাহুল্য, এটা অগভীর চিন্তার ফল। কারণ, এখানে ঐ সকল সুন্নত ও নফল নামাযের আলোচনা হচ্ছে, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে আদায় করতেন। জুমার দিনও তো দিনই বটে, রাত তো নয়। তাহলে এই ‘দিন’ সূর্য ঢলে যাওয়ার পর চার রাকাত নামায কেন হবে না? এ বিষয়ে জুমার দিনের নিয়ম যদি আলাদা হত তাহলে আলী রা. তা বলতেন। বলেননি যখন বোঝা গেল যে, জুমার দিনেও এ নামায পড়া হত। জুমার দিন কি ইশরাক, চাশত ও আসরের আগের সুন্নতসমূহ নেই? তাহলে সূর্য ঢলে যাওয়ার পরের এই চার রাকাত কেন থাকবে না? এটিও তো ‘আন নাহার’ (দিবস) শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

৪. আব্দুল্লাহ ইবনুস সাইব রা. বর্ণনা □□□□□□□-

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس، قبل الظهر، وقال : إنها ساعة تُفْتَح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢলার পর যোহরের আগে চার রাকাত নামায পড়তেন। এবং বললেন ‘এই সময় (সূর্য ঢলার পর) আসমানের দরজাসমূহ খোলা হয়। আমি চাই, এ সময় আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক। -আশ শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, তিরমিযী, হাদীস : ২৯৫; জামে তিরমিযী, হাদীস : ৪৮২; মুসনাদে আহমদ খ. ৬, পৃ. ৪১১, হাদীস : ১৫৩৯৬

ইমাম তিরমিযীর মতে, হাদীসটি ‘হাসান’।

এ হাদীসে সূর্য ঢলার পর চার রাকাত নামাযের কথা এসেছে। এটিই জুমার দিন ‘কাবলাল জুমা’, অন্যান্য দিন ‘কাবলায যোহর’। যেহেতু ছয়দিন তা কাবলায যোহর তাই একে বলা হয়েছে ‘কাবলায যোহর’। নতুবা এ নামাযের যে হিকমত বর্ণনা করা হয়েছে (অর্থাৎ সূর্য ঢলার সময় আসমানের দরজা খোলা হয়, এ কারণে এ সময় কোনো নেক আমল পাঠানো উচিৎ’) তা তো জুমার দিনেও আছে। জুমার দিনও তো সূর্য ঢলে এবং আসমানের দরজা খোলে। সুতরাং ঐ দিন চার রাকাত রহিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। পরবর্তী হাদীস থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়।

৫. আবু আইয়ুব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت : يا رسول الله إنك تُدْمِن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال : إن أبـواب السـماء تفتح عنـد زوال الشـمس. فلا تـرتج حـتى

يُصَلي الظهر، فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير؟ قلت : أفي كلهن قـراءة؟ قـال : نعم، قلت : هـل فيهن تسليم فاصل؟ قال : لا.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাললাম সর্বদা সূর্য ঢলার পর চার রাকাত নামায পড়তেন। আমি আরজ করলাম, আল্লাহর রাসূল ! আপনি সর্বদা সূর্য ঢললে চার রাকাত নামায পড়েন (এর তাৎপর্য কী ?) ইরশাদ করলেন, সূর্য ঢলার পর আসমানের দরজা খোলা হয়, এরপর যোহর পড়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। আমি চাই, ঐ সময় আমার কোনো নেক আমল ওপরে যাক। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'প্রতি রাকাতে কি কুরআন পড়তে হবে?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। বললাম, এর মাঝে কি সালাম ফিরাতে হবে? তিনি বললেন, 'না'। -আশ শামাইলুল মুহাম্মাদিয়্যাহ, তিরমিযী, হাদীস : ২৯৩; মুসনাদে আহমদ ২৩৫৩২

এ হাদীস বিভিন্ন সনদে মুসনাদে আহমদ সহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদগত মান কমসে কম 'হাসান লিগায়রিহী'। (দ্র. টীকা, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা খ. ৪, পৃ. ২৭৩, (৫৯৯২); পৃ. ১১৫ (৫৪০৫) শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা। শায়খ শুআইব আরনাউত তো মুসনাদে আহমদের টীকায় (হাদীস ২৩৫৫১) একে 'সহীহ লিগায়রিহী' বলেছেন।

এই হাদীস থেকে জানা গেল, সূর্য ঢলার পর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা (কোনো দিন বাদ দেওয়া ছাড়া) চার রাকাত পড়তেন। বোঝা গেল, জুমার দিনও পড়তেন, নতুবা সর্বদা পড়া হয় না। তাছাড়া এ চার রাকাতের যে কারণ বর্ণনা করা হয়েছে তা জুমার দিনেও রয়েছে।

আর এ বর্ণনার 'যোহর পড়া পর্যন্ত আসমানের দরজা বন্ধ করা হয় না, কথাটির অর্থ 'দুপুরের ফরয পড়া

পর্যন্ত'। যেমনটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবার (খ. ৪ পৃ. ২৭৩, হাদীস : ৫৯৯২) বর্ণনায় আছে। ঐ বর্ণনার আরবী পাঠ এই

إن أبواب الجنة تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تقام الصلاة، فأحب أن أقدم.

অর্থাৎ, সূর্য ঢলে গেলে জান্নাতের দরজা খোলা হয় এরপর নামায কায়েম হওয়া পর্যন্ত বন্ধ করা হয় না। একারণে আমি চাই, কিছু পাঠাতে।

এই নামায জুমার দিন জুমা, বাকি ছয় দিন জোহর।

এখানে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার করে দিতে চাই। সূর্য ঢলে যাওয়ার পরের চার রাকাত সম্পর্কে কেউ কেউ এই সম্ভাবনাও বের করেছেন যে, হতে পারে, এটি সূর্য ঢলার পরের আলাদা একটি নামায। এ কথা সঠিক বলে মেনে নিলেও তো মূল বিষয় অর্থাৎ জুমার দিনও জুমার আগে সূর্য ঢলার পর চার রাকাত পড়া উচিৎ। কারণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আমল করতেন ও এর ফযীলত ও তাৎপর্যও বয়ান করতেন। এখন এই নামাযের নাম কী রাখা হবে-কাবলাল জুমা নামায, না সূর্য ঢলার পরের নামায তা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু এই দাবির অধিকার তো কারো নেই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন জুমার আগে কোনো নামাযই পড়তেন না।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে গেল, তবু কিছু কথা বলা হল না। তবে যা কিছু আরজ করা হল, আশা করি এতে বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। অর্থাৎ, জুমার আগে যে পরিমাণ ইচ্ছা নফল পড়ুন, তা ছওয়াবের কাজ। তবে কমসে কম চার রাকাত তো অবশ্যই পড়া চাই। কারণ তার আলাদা গুরুত্ব আছে। এর গুরুত্ব ও তাকিদ হাদীস ও আছার দ্বারা প্রমাণিত এবং সাহাবা- তাবেয়ীন যুগে তা ব্যাপকভাবে পড়া হতো। সুতরাং কোনো অপযুক্তি-অপব্যাখ্যার শিকার হয়ে তা পরিত্যাগ ও অস্বীকার করা হবে খুবই দুঃখজনক ভুল।

শোনা যায়, কোনো কোনো মহল থেকে এ সুন্নতের উপর এভাবে প্রশ্ন তোলা হয় যে, আল্লাহর রাসূলের যুগে তো সূর্য ঢলার পরই জুমা শুরু হত। সুতরাং তখন সুন্নত পড়ার সময়ই ছিল না। সূর্য ঢলার আগে হচ্ছে মাকরূহ ওয়াক্ত । আর তার আগে তো জুমার ওয়াক্তই হয়নি। তাহলে ঐ সময় কোনো নামায পড়া হলে তা ‘কাবলাল জুমা’ কীভাবে হবে?

এই কুট প্রশ্নের জবাবে এখন শুধু দুটি কথা নিবেদন করছি:

১. কোনো হাদীসে এ কথা আছে যে, নবী-যুগে সূর্য ঢলার সঙ্গে সঙ্গেই জুমা শুরু হয়ে যেত, এমনকি চার রাকাত সুন্নত পড়ারও সুযোগ পাওয়া যেত না? আমাদের জানামতে এমন কথা কোনো হাদীসে নেই।

২. যারা কাবলাল জুমা সুন্নত অস্বীকার করেন তারা একথাও বলেন যে, সূর্য ঢলার আগেও জুমার নামায পড়া যায়। তা-ই যদি হয় তবে চার রাকাত সুন্নত সূর্য ঢলার আগে পড়লে ‘কাবলাল জুমা’ কেন হবে না? বরং তাদের অনেকে তো বলে, জুমার দিন দুপুরে কোনো মাকরূহ ওয়াক্ত নেই। তাহলে এদের তো একথা উচ্চারণ করারই অধিকার নেই যে, নবী যুগে জুমার আগে সুন্নত পড়ার সময়ই পাওয়া যেত না!

আর উপরে উল্লেখিত হাদীস ও আছার থাকা অবস্থায় এ জাতীয় কথা বার্তার কোনো অবকাশ থাকে কি? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং উম্মতের চরম দুর্দশার সময় তাদের প্রতি মমতাশীল হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

উল্লেখ্য, কাবলাল জুমা সুন্নত শুধু হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত নয়। এমনটা হলেও কোনো অসুবিধা ছিল না। কারণ দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্ত যে মাযহাবেরই হোক, দলীল-মান্যতার খাতিরেই তা গ্রহণ করা জরুরি। কোনো মুজতাহিদ যদি অন্য দলীলের কারণে ঐ সিদ্ধান্তের সাথে দ্বিমত করেন তবুও তাঁর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা জরুরি। কিন্তু এখানে

বাস্তবতা এই যে, কাবলাল জুমা নামায ‘সুন্নতে রাতিবা’ ও মুয়াক্কাদা হওয়াই অধিকাংশ ইমামের মাযহাব আর সেটাই দলীলেরও দাবি।

ইমাম ইবনে রজব রাহ. লিখেছেন, ‘এ বিষয়ে ইজমা আছে যে, জুমার আগে সূর্য ঢলার পর নামায পড়া একটি উত্তম আমল।’ মতপার্থক্য শুধু এখানে যে, ঐ নামায জোহরের আগের সুন্নতের মতো সুন্নতে রাতিবা, না আসরের আগের নামাযের মতো মুস্তাহাব। অধিকাংশ ইমামের মতে তা সুন্নতে রাতিবা। আওযায়ী, সুফিয়ান ছাওরী, আবু হানীফা ও তাঁর সঙ্গীদের সিদ্ধান্ত এটাই। ইমাম আহমদ রাহ.-এর বক্তব্য থেকেও তা-ই প্রকাশিত। তবে শাফেয়ী মাযহাবের পরবর্তী অনেক ফকীহ বলেছেন, তা মুস্তাহাব, সুন্নতে রাতিবা নয়।-ফাতহুল বারী, ইবনে রজব, খ. ৫, পৃ. ৫৪১, ৫৪২-৫৪৩

সুতরাং দলীলের কথা বললেও ‘সুন্নতে রাতিবা’র সিদ্ধান্তই অগ্রগণ্য। আর জুমহূর ও অধিকাংশ মনীষীর সিদ্ধান্তের কথা বললে তাঁদের সিদ্ধান্তও এটিই।

৯ মুহাররম, ১৪৩৪ হি.